চতুর্থ অধ্যায় ‖ ধ্বনিবাদ

"ধ্বনিবাদ ও শব্দার্থশক্তি"

এক তলার থেকে আর এক তলায় উঠতে গেলে সিঁড়ি ভাঙতে হয়। আমরা ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে এক একটা সিঁড়ি পেরিয়ে উঠে যাই ওপরে। কাব্যের রহস্য-আবিষ্কারও অনেকটা সিঁড়ি ভাঙ্গার মত। সংস্কৃত আলংকারিকগণ একদিনেই কাব্য-রসসাগরের সন্ধান পাননি। বেশ কয়েকটা সিঁড়ি অতিক্রম করে তাঁরা পৌঁছেছিলেন কাব্যের কাঙ্ক্ষিত জগতে। কাব্যাত্মার সন্ধানে অবতীর্ণ হয়ে আমরা বেশ কয়েকটা সিঁড়ি পেরিয়ে এসেছি। দেহাত্মবাদ, অলঙ্কারবাদ, রীতিবাদ ইত্যাদি বিষয়ে আমরা প্রয়োজনীয় আলোচনা করেছি। এবারে আর একটি নতুন সিঁড়ি অতিক্রম করার পালা। সংস্কৃত আলংকারিকগণ এই সিঁড়িটির নাম দিয়েছেন ধ্বনিবাদ।

ধ্বনিবাদ আসলে কি, কবে কার হাতে প্রথম তার জন্ম সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। ধ্বনিবাদের আলোচনা করতে গিয়ে আচার্য আনন্দবর্ধন ও তাঁর বিখ্যাত 'ধ্বন্যালোকঃ' গ্রন্থের কথা আমাদের প্রথমেই মনে আসে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাদের উদ্ভাবক ছিলেন না। এমন কোনো দাবিও আনন্দবর্ধন কখনো করেননি। তিনি ছিলেন সংকলক। তবে নিছক সংকলক বলে তাঁর কৃতিত্বকে খাটো করে দেখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। এই তত্ত্বের বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলি এতদিন ছড়ানো-ছিটানো ছিল। আনন্দবর্ধনই সেগুলিকে একত্রিত করে ধ্বনির আলোকে আমাদের আলোকিত করেছেন। ধ্বনিবাদ এমনই এক জোড়ালো মতবাদ ছিল যে এর প্রভাবে অলংকারবাদ ও রীতিবাদের প্রাধান্য নষ্ট হতে থাকে। ধ্বনিবাদের বিস্তৃত আঙিনায় অলংকার, গুণ, রীতি—এসব কিছুই ঠাঁই করে নেয়। এমনকি ধ্বনিবাদের পরবর্তী রসবাদও তার বিরোধিতা করেনি। ধ্বনিবাদ রসবাদের পরিপূরক হওয়ায় আলংকারিকদের দৃষ্টি ধ্বনিবাদের প্রতি খুব বেশি মাত্রায় পড়েছিল।

'ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য' সংস্কৃত আলংকারিক প্রদত্ত এই সূত্রটি ব্যাখ্যা করার আগে ভূমিকা হিসাবে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। ধ্বনির স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত জরুরি। এটিকে 'শব্দার্থ শক্তি' হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কাব্য হ'ল শব্দময় শিল্প। শব্দের ইষ্টক দিয়েই নির্মিত হয় কাব্যের হর্ম্য। শব্দ দিয়ে কাব্য শরীর গড়ে ওঠে বলে শব্দ দিয়েই আমরা কাব্যকে ছুঁই। তাই যে কোনো কাব্য রসিকেরই শব্দার্থশক্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা জরুরি।

আনন্দবর্ধন প্রমুখ আলংকারিকগণ ব্যাকরণের পদ্ধতি অনুসরণ করে শব্দের চার রকম শক্তির কথা বলেছেন। এগুলি হ'ল (১) অভিধাশক্তি (২) লক্ষণাশক্তি (৩) তাৎপর্যশক্তি ও (৪) ব্যঞ্জনাশক্তি।

অভিধাশক্তি : যে শক্তি বলে একটি নির্দিষ্ট শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থকে বোঝায় তাকে অভিধাশক্তি বলে। এটিকে শব্দের প্রচলিত অর্থ বলা যেতে পারে। যেমন যদি বলা হয়

Scanned with CamScanner

'বৃদ্ধ' তাহলে বয়সের ভারে নুয়ে পড়া একজন পরিণত বয়স্ক মানুষকেই বোঝাবে। 'বৃদ্ধ' বললে আমাদের মনে অল্পবয়স্ক কোনো শিশু কিংবা কিশোরের কথা মনে আসবে না। শব্দ ও অর্থের পারস্পরিক জ্ঞান পূর্ব থেকে না থাকলে অভিধাশক্তির দ্বারা সংকেতিত মুখ্য অর্থের ধারণা করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ যে কোনো দিন বুড়োমানুষ দেখেনি তার কাছে যদি 'বৃদ্ধ' শব্দের অর্থ জানতে চাওয়া হয় তাহলে পরিণত বয়স্ক একটি মানুষের কথা তার মনে কখনই আসবে না। শব্দের সঙ্গে অর্থের যে অবিছিন্ন যোগ আছে সেটি মানুষের মনে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই কারণেই 'গাঁদাফুল' বললে আমরা সাদা কোনো ফুল ভাবি না কিংবা 'গাড়ি' বললে 'বাড়ি' ভাবি না। অভিধাশক্তির দ্বারা সংকেতিত অর্থকে অর্থাৎ মুখ্য অর্থকে অভিধেয় অর্থ, বাচ্যার্থ বা শব্দার্থ বলে। যেমন বৃদ্ধ শব্দের অর্থ বয়স্ক বা পরিণত বয়স্ক।

লক্ষণাশক্তি : যে শক্তির বলে একটি শব্দ মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ বা অভিধেয়ার্থ ছাড়া মুখ্যার্থের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত আর একটি অর্থ কে বুঝিয়ে থাকে, তাকে লক্ষণা বলে। শব্দের অভিধেয় অর্থ বা মুখ্যার্থ যদি বাক্য বা বাক্যাংশের অর্থ পরিস্ফুটনে অক্ষম হয় তাহলে আমরা লক্ষণার দ্বারস্থ হই। "জীবনানন্দ ভালো করে না পড়লে পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না" এখানে মুখ্যার্থ ধরে যদি সমগ্র বাক্যটির অর্থ করতে যাওয়া হয় তাহলে বাক্যটির অর্থ ঠিক বোঝা যাবে না। জীবনানন্দ ছিলেন একজন মানুষ। তাঁকে ভালো করে পাঠ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এখানে ব্যক্তি জীবনানন্দকে পাঠ করার কথা বলা হয়নি, তাঁর সাহিত্যকর্মকে বোঝানো হয়েছে। এখানে মুখ্যার্থ গ্রহণে বাধা আছে বলেই আমরা একটি গৌণ অর্থ ধরে বাক্যটির অর্থ করলাম। যখন অভিধাশক্তি শব্দের মুখ্যার্থকে বুঝতে বাধা দেয় তখন যে শক্তির সাহায্যে আমরা অভিধা, বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট শব্দটির প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারি তাকেই বলে লক্ষণাশক্তি। এই শক্তির দ্বারা আমরা যে গৌণ অর্থকে বুঝে থাকি তাকে লক্ষ্যার্থ বলে।

এই লক্ষণাকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে (১) রূঢ়ি লক্ষণা (২) প্রয়োজন লক্ষণা। 'রূঢ়ি' শব্দের অর্থ হল লোকপ্রসিদ্ধি। যেমন 'অসভ্য চীন অসভ্য জাপান তারাও স্বাধীন তারাও মহান'। এই কাব্যপংক্তিটির মুখ্যার্থ ধরে যদি অর্থ করতে যাওয়া হয় তাহলে আমাদের অর্থ বুঝতে অসুবিধা হবে। একটা দেশ কখনো অসভ্য, স্বাধীন কিংবা মহান হতে পারে না। এখানে চীন ও জাপান বলতে ভৌগোলিক ভূখন্ড কে বোঝানো হয়নি। চীন ও জাপান দেশের মানুষকে বোঝানো হয়েছে। চীন-জাপানবাসীকে বোঝাতে উল্লিখিত পংক্তিতে শুধু 'চীন' ও 'জাপান' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপ ভাবে যদি বলা হয়, 'আমি নজরুল পড়তে ভালোবাসি' তবে নজরুল বলতে নজরুলের রচিত সাহিত্যকেই বোঝাবে। এই উদাহরণ গুলির সবই লোক ব্যবহারে প্রসিদ্ধ বলে এগুলি রূঢ়ি লক্ষণার উদাহরণ। এখানে চীন, জাপান ও নজরুল হল লক্ষক; আর চীন ও জাপানবাসী এবং নজরুলের 'সাহিত্য' হল লক্ষ্য। উদাহরণ গুলিকে 'রূঢ়ি' বলার কারণ এগুলি লোক ব্যবহারে পরিচিত। আমরা ওগুলিকে যে রকম করে বলা হয়েছে ও রকম ভাবে বলতেই অভ্যস্ত। 'নজরুল' শব্দটি দিয়ে যখন আমরা কাজ চালাতে পারি

Scanned with CamScanner

এবং লোকেও যখন তা বোঝে তখন আর আমরা অনর্থক নজরুলের রচিত সাহিত্য বা কাব্য—এমন ভাবে ভেঙে বলি না।

'প্রয়োজন লক্ষণা'ই হল প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধি লক্ষণা। রূঢ়ি লক্ষণা অপেক্ষা তা অনেক উন্নত স্তরের। যেখানে লক্ষণার মূলে কোনো প্রয়োজন থাকে তাকে 'প্রয়োজনলক্ষণা' বলে। এটি আসলে কি তা ব্যাখ্যাযোগ্য। যেমন :

"এমন মানব-জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা"

এখানে সোনার মুখ্য অর্থ মূল পংক্তিটির সঙ্গে সংগতি বিধায়ক নয়। তাই শব্দটিকে মুখ্যার্থে গ্রহণ করতেও অসুবিধা হয়। কিন্তু 'সোনাকে' গৌণ অর্থে অর্থাৎ 'ঐশ্বর্য' 'সমৃদ্ধি' ইত্যাদি অর্থে গ্রহণ করলে পংক্তিটির মধ্যে অর্থ-সংগতি রচিত হয়। অর্থ-সংগতির পাশাপাশি অর্থের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যও ঘটে। 'ঐশ্বর্য' ও 'সমৃদ্ধি' কে বোঝানোর প্রয়োজনে 'সোনা' শব্দটির ব্যবহার খুবই উপযুক্ত হয়েছে। কিন্তু 'আমি নজরুল পড়তে ভালোবাসি'— এই উদাহরণে নজরুল শব্দটি কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ করেনি। 'আমি নজরুলের সাহিত্য পড়তে ভালোবাসি' বললেও কোনো ক্ষতি ছিল না। কিন্তু 'সোনা' শব্দটিকে কবি রামপ্রসাদ যে ভাবে প্রয়োগ করেছেন তাতে নিষ্ফল জীবনকে ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধময় করে তোলার অর্থটি সুন্দর ফুটেছে। বিশেষ সুন্দর করে অর্থ প্রকাশের প্রয়োজনেই 'সোনা' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। আমাদের তাই মনে হয় 'সোনা' শব্দটি ছাড়া 'ঐশ্বর্য' ও 'সমৃদ্ধি' কে যেন বোঝানোই যেতো না। 'সোনা শব্দের সূত্র ধরে আমরা যে 'ঐশ্বর্য' 'সমৃদ্ধি' ইত্যাদি সূক্ষ্ম গোপন অর্থের ইঙ্গিত পেলাম তাকে 'লক্ষণামূলক ধ্বনি' বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

প্রয়োজন লক্ষণার আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

"বুকের মধ্যে বাঘ নিয়ে ঘুমিয়েছি কতকাল
এবার জেগেছে সে চরম প্রহরে।"

বুকের মধ্যে কোনো মানুষ বাঘ নিয়ে ঘুমোতে পারে না। তাই মুখ্যার্থে 'বাঘ' শব্দটিকে গ্রহণ করা যায় না। মুখ্যার্থ এখানে বাধিত। সুতরাং বাঘ বলতে এখানে অন্য কিছু বোঝানো হয়েছে। সেটা হিংস্রতা, প্রতিহিংসা, বিদ্রোহী মনোভাব—এরকম অনেক কিছু হতে পারে। আগের উদাহরণটির মত এটিতেও যেহেতু সূক্ষ্ম গোপন অর্থের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাই এখানেও লক্ষণামূলকধ্বনি হয়েছে। গোপন সৌন্দর্য লাভের এই অভিপ্রায়কে অভিনব গুপ্ত 'প্রয়োজন' বলেছেন। রূঢ়ি লক্ষণায় যেহেতু আমাদের সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না তাই রূঢ়ি লক্ষণা প্রয়োজন লক্ষণার মত উন্নত নয়।

রূঢ়ি এবং প্রয়োজন— উভয় লক্ষণাতেই মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থের সঙ্গে লক্ষ্যার্থের একটি সম্বন্ধ থাকে। তবে রূঢ়ি লক্ষণায় লক্ষ্যার্থের সঙ্গে বাচ্যার্থের সম্বন্ধ অনেক বেশি স্থূল। গোপন সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষমতা তার নেই। রূঢ়ি লক্ষণা মুখ্যার্থকে ছাড়িয়ে লক্ষ্যার্থের দিকে খুব বেশি দূর যেতে পারে না বলে তার থেকে গভীরতর কোনো অর্থ আবিষ্কৃত হয় না। অন্য দিকে প্রয়োজন লক্ষণার গভীরতা অনেক বেশি বলে তা গোপনতম সৌন্দর্য

Scanned with CamScanner

আবিষ্কারে সক্ষম হয়। কাব্য যেহেতু দেহের উপরিতল থেকে আত্মার দিকে পাঠককে টেনে নিয়ে যায় তাই কাব্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজন লক্ষণার গুরুত্ব অনেক বেশি।

তাৎপর্যশক্তি : ব্যঞ্জনাবাদীদের অনেকেই তাৎপর্য শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও অভিনবগুপ্তের আলোচনায় তাৎপর্য শক্তির বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। আমরা সকলে জানি যে বহু শব্দ পাশাপাশি বসে একটি বাক্য গঠন করে। বাক্যের অর্ন্তগত প্রতিটি শব্দের পৃথক পৃথক অর্থ থাকে। আবার পাশাপাশি কয়েকটি শব্দ বাক্যের মধ্যে অন্বিত হলে সামগ্রিক একটি অর্থ প্রকাশ করে। পাশাপাশি কয়েকটি শব্দ একত্রে মিলিত হয়ে অন্বয়বোধের দ্বারা যদি একটি অখন্ড অর্থকে প্রকাশ করে তবে তাকে তাৎপর্য শক্তি বলে। শব্দের চেয়ে বাক্যের অর্থই যেহেতু তাৎপর্য শক্তিতে গুরুত্ব পায় তাই সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'কাব্য বিচার' গ্রন্থে 'তাৎপর্য শক্তি'কে 'বাক্যশক্তি' বলে অভিহিত করেছেন। যেমন 'আমি' 'ভাত' ও 'খাই' এই তিনটি শব্দের পৃথক পৃথক ভাবে একটি করে অর্থ আছে। কিন্তু এই তিনটি শব্দ যখন পাশাপাশি বসে একটি সামগ্রিক অর্থ প্রকাশ করে তখন বিচ্ছিন্ন শব্দগুলির তুলনায় বাক্যটির অর্থ তাৎপর্যগত ভাবে কিছুটা আলাদা হয়ে যায়। এই সামগ্রিক বা অখন্ড অর্থটিকে তাৎপর্য বলা যেতে পারে।

শব্দের যে তিন শক্তি নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করা গেলো সেগুলি ধ্বনিবাদ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই স্থিরীকৃত হয়েছিল। কিন্তু ধ্বনিবাদীরা আলোচনায় অবতীর্ণ হয়ে দেখালেন যে, শব্দের এই তিন শক্তি আসলে বাচ্যার্থকেই প্রকাশ করে। সার্থক কাব্য বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে যে গভীরতর অর্থের প্রকাশ ঘটায় এই তিন শক্তির সাহায্যে তাকে পাওয়া যায় না। ধ্বনিবাদীদের মতে, এই তিন শক্তির কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষমতা নেই। অভিধাশক্তির দ্বারা লভ্য অর্থ সবচেয়ে আগে ফুরিয়ে যায়। লক্ষণাশক্তি শব্দের অর্থকে আরও কিছুদূর সম্প্রসারিত করে ঠিকই কিন্তু তারও একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। অনুরূপ ভাবে তাৎপর্য শক্তির ক্ষমতাও খুবই সীমিত। কিন্তু শব্দের এমন একটি শক্তি আছে যার ক্ষমতা অসীম। একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পর তা থেমে যায় না। তা শব্দ ও অর্থের সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে অনেক অনেক বেশি অর্থ প্রকাশে সক্ষম। এই শক্তিকে সংস্কৃত আলংকারিকগণ 'ব্যঞ্জনা' নামে অভিহিত করেছেন। ব্যঞ্জনাশক্তির কোনো পরিমাপ করা যায় না—"ব্যঞ্জনং ন তুলাধৃতম"। যে কোন কাব্যে এই ব্যঞ্জনাশক্তিরই প্রাধান্য।

ব্যঞ্জনাশক্তি : যেখানে কাব্যের বাচ্যার্থ কোনো রকম বাধা না পেয়ে নিজ স্বরূপে প্রকাশিত হয় অথচ বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে পাঠক পাঠিকার মনে একই সময়ে আরও একটি অর্থ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই অর্থটিকে বলা হয় ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা। আর যে শক্তির সাহায্যে এই ধ্বনির অর্থকে পাওয়া যায় তাকে ব্যঞ্জনাশক্তি বা ব্যঙ্গ্যশক্তি বলে। ধ্বনি থেকে আমরা যে অর্থ লাভ করি তাকে ব্যঙ্গ্যার্থ বা প্রতীয়মানার্থ বলে। ধ্বনি থেকে প্রাপ্ত অর্থটিকে আমরা ঘন্টাধ্বনির অনুরণনের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। একটি ঘন্টা বেজে উঠেই তার কাজ শেষ করে না। দীর্ঘক্ষণ ধরে অনুরণনের মাধ্যমে তার ক্রিয়া চলতে থাকে। ঠিক সে রকমই সার্থক কবিতা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে সহৃদয় পাঠকদের চিত্তে যে বাচ্যার্থের বোধ জন্মায় তা-ই তাদের নিয়ে যায় বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে অনেক দূরে। এই সূত্রে পাঠকদের চিত্তে নূতন একটি অর্থের সূক্ষ্ম-স্পন্দন অনুভূত

Scanned with CamScanner

হতে থাকে। এই নূতন অর্থটি হল ব্যঙ্গ্যার্থ বা প্রতীয়মানার্থ। 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে 'প্রতীয়মান অর্থ' কে নারীদেহের লাবণ্যের সঙ্গের তুলনা করা হয়েছে। নারীদেহের লাবণ্য দেহ কে আশ্রয় করে থাকলেও যেমন দেহকে ছাপিয়ে ওঠে, ঠিক সেই রকমই মহাকবিদের বাণীতে এমন একটি বস্তু থাকে যা কাব্যশরীরকে আশ্রয় করে থেকেও তাকে অতিক্রম করে যায়। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব কাব্য' থেকে একটি চির পরিচিত উদাহরণ দিয়ে ধ্বনির স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অঙ্গিরা হিমালয়ের কাছে মহাদেবের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এলে কালিদাস লিখেছেন :

"এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী।।"

এর সুন্দর বঙ্গানুবাদ করেছেন অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী :

"দেবর্ষি যবে কহিলা একথা
পিতার পার্শ্বে পার্ব্বতী নতাননী
হেরিতে লাগিল লীলাকমলের
দলগুলি গণি গণি।"

এই অংশটির কাব্যত্ব নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন তুলবে না। কোনো অলংকারের সুষমায় এর কাব্যত্ব নয়, কারণ সে রকম কোনো অলংকারই এখানে নেই। ধ্বনিবাদীরা এর কাব্যত্ব 'লীলাকমলের পত্রগণনা'র মধ্যে লক্ষ্য করেছেন। কারণ তা বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে সহৃদয় পাঠককে অর্থান্তরে নিয়ে যায় এবং তার থেকে পূর্বরাগের লজ্জার ব্যঞ্জনা উৎসারিত হয়। অঙ্গিরার বিবাহ-প্রস্তাবে পার্বতীর মনে রতি (প্রেম) উদ্দীপিত হয়েছে। এই উদ্দীপিত রতির স্বাভাবিক ফল হল হর্ষ, যা অবশ্যম্ভাবী ভাবে চোখ মুখে প্রকাশিত হওয়ার কথা। কিন্তু এই হর্ষজনিত বিকার প্রকাশিত হওয়ার আগেই সামনে গুরুজন থাকায় তার লজ্জা এসেছে। 'লজ্জা' তার 'অবহিত্থা' নামক গৌণ বাসনাকে জাগিয়ে দেয়। 'অবহিত্থা' সঞ্চারী বা ব্যভিচারী হলেও ভাব। কিন্তু এই ভাব যে জেগেছে তা বোঝা যায় পার্বতীর নতুন বিকারে বা আচরণে। যার প্রমাণ আছে মুখ অবনত করায় ও লীলাপদ্মের পত্র গণনায়। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে কবি এখানে ব্যঞ্জনায় যে বক্তব্যটি উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন তা সরাসরি ভাবে না বলে কিছুটা ইঙ্গিতে বলেছেন। এই ইঙ্গিতটুকু উপলব্ধি করতে না পারলে, আমরা এর প্রতীয়মান অর্থটুকু বুঝতে পারবো না। ইংরাজীতে একেই বলে 'Suggested Sense'। এই ইঙ্গিতের অভাব ঘটলে, অর্থাৎ Flat করে কোনো বক্তব্য উপস্থাপিত হলে, তা আর যাই হোক প্রথম শ্রেণীর কাব্য হবে না। কালিদাসের শ্লোকটিকেই যদি আবরণ না দিয়ে সরাসরি বলা হত :

"বরের কথায় উমার হল পুলকের উদগম
নত মুখে লজ্জা পেয়ে বলল কথা কম"

তবে তার কাব্যমহিমা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মদনভস্মের পর' কবিতায় লিখেছিলেন :

"পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী!
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

Scanned with CamScanner

ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে ওঠে নিশ্বাসি
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।''

এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এর বক্তব্য বাচ্যকে ছাড়িয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে মানবমনের চিরন্তন বিরহ, যা মিলনের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে তারই ইঙ্গিত করেছেন এবং সেখানেই এর কাব্যত্ব।

এবারে আধুনিক কবি জয় গোস্বামীর 'মাসিপিসি' কবিতাটি নেওয়া যাক :

''ফুল ছুঁয়ে যায় চোখের পাতায় জল ছুঁয়ে যায় ঠোঁটে
ঘুম পাড়ানী মাসিপিসি রাত থাকতে ওঠে

শুকতারাটি ছাদের ধারে, চাঁদ থামে তালগাছে
ঘুম পাড়ানী মাসিপিসি ছাড়া কাপড় কাচে

দু-এক ফোঁটা শিশির তাকায় ঘাসের থেকে ঘাসে
ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি ট্রেন ধরতে আসে

ঘুম পাড়ানী মাসিপিসির মস্ত পরিবার
অনেকগুলো পেট বাড়িতে, একমুঠো রোজগার

ঘুম পাড়ানী মাসিপিসির পোঁটলা পুঁটলি কোথায়?
রেল বাজারের হোমগার্ডরা সাত ঝামেলা জোটায়

সাল মাহিনার হিসাব তো নেই জষ্টি কি বৈশাখ
মাসিপিসির কোলে কাঁখে চালের বস্তা থাক

শতবর্ষ এগিয়ে আসে—শতবর্ষ যায়
চাল তোলো গো মাসিপিসি লালগোলা বনগাঁয়''

এই কবিতায় বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে উঠেছে তার ব্যঞ্জনা। ব্যাচ্যার্থে মাসিপিসিদের চালের ব্যবসার কথা বলা হলেও ব্যঞ্জনায় যুগ যুগ ধরে অনাহারী, সংগ্রামী মানুষগুলোর পরিবর্তনহীন অবস্থার কথা বলা হয়েছে। সভ্যতার বদল ঘটে, সময় এগিয়ে চলে, শতবর্ষ পার করে নতুন শতবর্ষের সূচনা হয় কিন্তু অনাহারী, অর্ধাহারী, সংগ্রামী মানুষগুলোর জীবনের ট্রাজিডির কোনো বদল ঘটে না। এক বৈচিত্র্যহীন বেঁচে থাকাকে সঙ্গী করে তাদের আজীবন কাটে। যে কোনো সার্থক কবিতার মত এখানেও ব্যাচ্যার্থকে আশ্রয় করে ব্যঞ্জনা সৃষ্ট হয়েছে কিন্তু তা বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে গেছে।

এখন পর্যন্ত আমরা কয়েকটি উদাহরণ সহযোগে কবিতার ব্যঙ্গ্যার্থ আসলে কি তা বোঝাতে সচেষ্ট হয়েছি। তবে মনে রাখা দরকার যে কেবল শব্দার্থের জ্ঞান থাকলেই কবিতার ব্যঙ্গ্যার্থকে বোঝা যাবে না। আবার ব্যঙ্গ্য অর্থ বুঝতে গেলে বাচ্যার্থের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া দরকার। কারণ সহৃদয় পাঠকের মনে যে ব্যঙ্গ্যার্থের জন্ম নেয় তা বাচ্যার্থের পথ বয়েই। যেমন উপযুক্ত আলো পেতে গেলে প্রদীপ শিখার ব্যাপারে যত্নশীল হতে

Scanned with CamScanner

হয় তেমনি বাচ্যার্থের ব্যাপারে যত্নশীল না হলে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি জন্মায় না। প্রদীপ শিখা কম্পিত হলে উপযুক্ত আলো লাভ করা যায় না, অনুরূপভাবে বাচ্যার্থের প্রতীতি না জন্মালে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি জন্মায় না। সন্তান যেমন মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নিয়ে স্ব-প্রতিভার গুণে মাতাকেই আচ্ছন্ন করে দিতে পারে তেমনি ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থের মধ্যে থেকে উদ্ভূত হয়ে বাচ্যার্থকে গৌণ করে দেয়।

● ***"সমাসোক্তি ও সংকরালংকারে যে ব্যঞ্জনা থাকে, সে ব্যঞ্জনা কাব্যের আত্মা ধ্বনি নয়" :***

বাচ্যকে ছাড়িয়ে যা বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা করে তাকেই আমরা ধ্বনি বলে অভিহিত করেছি। তবে বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা মাত্রই যে ধ্বনি হয় না তার প্রমাণ সমাসোক্তি ও সংকরালঙ্কার। শ্রেষ্ঠ কবিরা এমন কৌশলে এই অলংকারগুলি প্রয়োগ করেন যে, আমাদের মনে হয় ঐ অলংকার বুঝি বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে ধ্বনিতে নিয়ে গেল। কিন্তু প্রকৃত কাব্যরসিক জানেন যে কাব্যের আত্মা যে ধ্বনি তা সেখানে নেই। কারণ একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সমাসোক্তি কিংবা সংকরালংকারে বাচ্যই প্রধান। এই অলংকারগুলিতে ধ্বনির যে আভাসটুকু থাকে তা বাচ্যার্থের অনুযায়ী মাত্র। বিষয়টিকে ভালো ভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে সমাসোক্তি ও সংকরালংকারের সংজ্ঞা দেওয়া দরকার।

সমাসোক্তি অলংকারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, উপমেয়ের ওপর উপমানের ব্যবহার আরোপিত হলে সমাসোক্তি অলংকার হয়। এখানে উপমেয়টি সর্বদা অচেতন বা জড়বস্তু এবং উপমানটি সর্বদা সচেতন বস্তু বা জীব বলে বিবেচিত হয় এবং এই জড়ের ওপর জীবের ধর্ম আরোপিত হলেই সমাসোক্তি অলংকার হয়। এই অলংকারে বর্ণিত বস্তুতে অন্য বস্তুর ব্যবহার আরোপ করে বর্ণনা করাই হলো রীতি; কিন্তু ঐ ভিন্ন বস্তু বা তার ব্যবহারের স্বতন্ত্র কোনো উল্লেখ এখানে থাকে না। বর্ণিত বস্তুর কার্য বর্ণনা বা বিশেষণের মধ্যেই এমন ইঙ্গিত থাকে, যা তাদের সূচিত করে। সমালোচক অতুলচন্দ্র গুপ্ত 'কাব্যজিজ্ঞাসা' গ্রন্থে আনন্দবর্ধন থেকে একটি উদাহরণ দিয়েছেন :

"উপোঢ়রাগেণ বিলোলতারকং তথা গৃহীতং শশিনা নিশামুখম্।
যথা সমস্তং তিমিরাংশুকং তয়া পুরোঽপি রাগাদ গলিতং ন লক্ষিতম্॥"

"উপগত সন্ধ্যারাগে আকাশে যখন তারকা অস্থিরদর্শন, সেই নিশার প্রারম্ভে যেমন চন্দ্রোদয় হল, অমনি পূর্বদিকের সমস্ত তিমির যবনিকা কখন যে রশ্মিরাগে অপসৃত হল তা লক্ষ্যই হল না"। এখানে রাত্রি ও চন্দ্রে নায়ক-নায়িকার ব্যবহার আরোপ করে বর্ণনা করা হলেও আনন্দবর্ধনের মতে যথার্থ ধ্বনি বলতে যা বোঝায় তা এখানে নেই। কেননা এখানে বাচ্যই প্রধান এবং ব্যঙ্গ্যার্থ তার অনুগামী মাত্র। বর্ণিত বস্তুতে নায়ক ও নায়িকার ব্যবহার আরোপ করে যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টির প্রয়াস করা হয়েছে, তা আসলে বাচ্যার্থেরই বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছে। প্রকৃত ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা যাকে বলে তা এখানে নেই। এবারে বাংলা থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক :

"বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম অবসানে

Scanned with CamScanner

দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া আছে চাহি
দিগন্তের পানে।"

এই উদাহরণে উপমের 'বসুন্ধরা' একটি জড়বস্তু। কিন্তু উপমান (সচেতন বস্তু) উহ্য আছে। তা হবে মনুষ্য গৃহিনী (নারী)। যেমন গৃহিনী দিনের কাজকর্ম সেরে বেড়ার ধারে অন্যমনে দিগন্তের পানে তাকিয়ে থাকে, ঠিক তেমনি বসুন্ধরাও সেই নারীর মত দিনের কাজ শেষ করে দিনান্তের বেড়া ধরে দিগন্তের পানে তাকিয়ে আছে। এখানে জড়বস্তু বসুন্ধরার ওপর কাব্যাংশে অনুক্ত উপমান গৃহিনীর সমস্ত গুণের আরোপ করা হয়েছে। বর্ণিত বস্তুতে এখানে অন্য বস্তুর ব্যবহার আরোপিত হওয়ার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হলেও তা অন্বয় ও বাক্যার্থের অনুযায়ী মাত্র। ব্যঙ্গ্যের যে আভাসটুকু এখানে আছে তা বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি বলেই শ্রেষ্ঠধ্বনির উদাহরণ এটি নয়।

সঙ্করালংকারের বিষয়টিকে অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী তাঁর 'অলঙ্কার চন্দ্রিকা' গ্রন্থে সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। সংসৃষ্টি ও সংকর অলংকারের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে তিনি তিল ও চালের মিশ্রণ এবং দুধ ও জলের মিশ্রণের কথা বলেছেন। তিল ও চালের মিশ্রণ থেকে আমরা একটু চেষ্টা করলেই উভয়কে পৃথক করতে পারি কিন্তু দুধ ও জলের মিশ্রণ থেকে উভয়কে পৃথক করা যায় না। অনেক সময় কবির কাব্যে অলংকার তিল ও চালের মত মিশে থাকে। অর্থাৎ একটি স্তবকে হয়তো অনেকগুলি স্বাধীন অলংকার থাকে, যেগুলিকে পরস্পরের থেকে পৃথক করা যায়। যেমন একটি সুন্দর হাতে যদি কঙ্কন, চুড়ি ও আংটি থাকে তাহলে এই তিনটি অলংকারকে আলাদা ভাবে খুলে রাখা যায়। কিন্তু যদি একটি সুন্দর হাতে চুড়ি ও ঘড়ি একত্র মিলে ব্রেসলেট-রিস্টওয়াচ তৈরি করে তবে দুটিকে পৃথক করা মুশকিল হয়। এ মিশ্রণ অনেকটা যেন দুধ ও জলের মত। সংসৃষ্টি অলংকারে প্রত্যেকটি অলংকারের অবস্থিতি স্বাধীন, কিন্তু সংকর অলংকারে একাধিক অলংকার এমনভাবে মিশে যায় যে তাদের স্বাধীনতা নষ্ট হয়। তাই সংকর অলংকারের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে এই ভাবে : একটি রচনায় একাধিক অলংকার যদি এমন ভাবে মিশে থাকে যে একটি থেকে আর একটিকে আলাদা করা যায় না অথবা অলংকার নির্ণয়কালে কোন্ অলংকার হবে তা নিয়ে সংশয় জাগে এবং একাধিক অলংকার থাকার কোন্‌টি প্রধান অলংকার তা নিয়ে সন্দেহ থাকে, তবে তাকে সংকর অলংকার বলে। সংকর অলংকারে যেহেতু একাধিক অলংকার মিলেমিশে যায় তাই এখানে যে ব্যঞ্জনা থাকে তা এক অলংকার দিয়ে অন্য অলংকারের ব্যঞ্জনা। এ ব্যাপারে লোচনকার অভিনবগুপ্ত কুমারসম্ভবের একটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন :

"প্রবাতনীলোৎপলনির্বিশেষমধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা
কিং গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্যস্ততো গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভিঃ"

"বায়ুকম্পিত নীলপদ্মের মতো সেই আয়তলোচনার চঞ্চল দৃষ্টি, সে কি হরিণীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে, না, হরিণীরাই তার কাছে গ্রহণ করেছে, তা সংশয়ের কথা।" এখানে বক্তব্য হল একটি উপমা। যৌবনারূঢ়া পার্বতীর দৃষ্টি হরিণের দৃষ্টির মত চঞ্চল। কিন্তু এই উপমাটি প্রত্যক্ষভাবে এবং স্পষ্ট করে না বলে একটি সন্দেহ অলংকারের

Scanned with CamScanner

মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাচ্যার্থে সন্দেহ অলংকার থাকলেও ব্যঞ্জনায় উপমাকে আভাসিত করা হয়েছে। কিন্তু এই ব্যঞ্জনাকে ধ্বনি বলা যাবে না। কারণ এখানে কবি এক অলংকার দিয়ে অন্য অলংকারের ব্যঞ্জনা দিয়েছেন। আমরা ধ্বনি বলতে যা বুঝি, যা বাচ্য, অলংকার সব কিছুকে ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ের ব্যঞ্জনা জাগিয়ে তোলে তা এখানে নেই। এবারে বাংলা কবিতা থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক :

"হাসিখানি স্থির
অশ্রুশিশিরেতে ধৌত"

এখানে 'অশ্রুশিশির' কোন্ অলংকার তা নিয়ে পাঠকের মনে সংশয় জাগে। অশ্রু, শিশিরের মতন বলে অশ্রু অর্থাৎ উপমেয়কে প্রাধান্য দিলে অলংকারটিকে উপমা বলতে হয়। আবার অন্যদিকে অশ্রু ও শিশিরের মধ্যে অভেদ কল্পনা করে (অশ্রু রূপ শিশির) যদি উপমান শিশিরকে প্রাধান্য দেওয়া হয় তবে অলংকারটিকে রূপকও বলা যেতে পারে। সুতরাং এখানেও এক অলংকার দিয়ে অন্য অলংকারের ব্যঞ্জনা করা হয়েছে । কিন্তু এখানে অলংকারের যে ব্যঞ্জনাটুকু আছে তা শ্রেষ্ঠধ্বনিকে ছুঁতে পারেনি। সুতরাং "যেখানে শব্দার্থ কেবলমাত্র বস্তু বা অলংকারের ব্যঞ্জনা করে, সে ব্যঞ্জনা শ্রেষ্ঠ কাব্যের ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা নয়। যে ধ্বনি কাব্যের আত্মা, তার ব্যঞ্জনা কাব্যের বাচ্যার্থকে বস্তু ও অলংকারের অতীত এক ভিন্ন লোকে পৌঁছে দেয়"। সমাসোক্তি কিংবা সংকর অলংকারে সেই ব্যঞ্জনা থাকে না।

● "ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য"

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠা একদিনে হয়নি। কাব্যের শব্দার্থ, অলংকার ইত্যাদির আলোচনা বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা বিপর্যস্ত হলে ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। বস্তুবাদী আলংকারিকগণ তাঁদের আলোচনায় ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকার করতে চাননি। কাব্য যে তার বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে কথার অতীতলোকে পাঠককে নিয়ে যায়, এ ধরনের কথাবার্তা তাঁদের কাছে হেঁয়ালি বলে মনে হয়েছে। কাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে তাঁরা বার বার ঘুরপাক খেয়েছেন বাচ্য, গুণ, অলংকার ইত্যাদির জগতে। ধ্বনিবাদীরা যে ধ্বনিকে 'অপূর্ববস্তু' বলে উল্লেখ করেছেন, বস্তুবাদীরা তাকেই খুঁজে পেয়েছেন কাব্যের শোভা, গুণ ও অলংকারের মধ্যে। এ সবের অতিরিক্ত ধ্বনি বলে কিছু নেই বলেই তাঁদের বিশ্বাস ছিল। আনন্দবর্ধন তাঁর 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে মনোরথ নামে এক সমসাময়িক কবির বক্তব্য তুলে ধরেছেন, যা বস্তুবাদী আলংকারিকদের মনোরথ পূর্ণ করতে পারে :

"যস্মিন্নস্তি ন বস্তু কিঞ্চন মনঃপ্রহ্লাদি সালংকৃতি
বুৎপন্নৈ রচিতং চ নৈব বচনৈর্বক্রোক্তিশূন্যা চ যৎ।
কাব্যং তদধ্বনিনা সমন্বিতমিতি প্রীত্যা প্রশংসন জড়ো
নো বিদ্মোঽভিদধাতি কিং সুমতিনা পৃষ্টঃ স্বরূপং ধ্বনেঃ॥"

"যে কবিতায় সুষমাময় মনোরম বস্তু কিছু নেই, চতুর বচনবিন্যাসে যা রচিত নয়

এবং অর্থ যার অলংকারহীন, জড়বুদ্ধি লোকেরা গতানুগতিকের প্রীতিতে (অর্থাৎ ফ্যাশানের খাতিরে) তাকেই ধ্বনিযুক্ত কাব্য বলে প্রশংসা করে। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকের কাছে 'ধ্বনি'র স্বরূপ কেউ ব্যাখ্যা করেছে, এ তো জানা যায় না''। মনোরথের এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে সে যুগে ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠা খুব সহজে হয়নি। সে যুগে ধ্বনিবাদীদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিপক্ষ খাড়া হয়েছিল। তাই বিভিন্ন রকম সংশয় কাটিয়ে আচার্য আনন্দবর্ধনকে ধ্বনির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে বিশেষ যত্নবান হতে হয়েছিল। অত্যন্ত সূক্ষ্ম যুক্তির জাল বিছিয়ে, বিরুদ্ধ মতবাদীদের সকল বক্তব্য খণ্ডন করে তিনি 'ধ্বনি কাব্যের আত্মা'—এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

ধ্বনির লক্ষণ বিচার করতে গিয়ে ধ্বনিবাদীরা ভূমিকা হিসাবে কাব্যের দুটি অর্থের কথা বলেছেন— (১) বাচ্য অর্থ (২) প্রতীয়মান অর্থ। বাচ্য অর্থ বলতে কি বোঝায় সে আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। কিন্তু মহাকবিদের বাণীতে বাচ্য অর্থের অতীত আর এক অর্থ থাকে যাকে প্রতীয়মান অর্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থ বলা হয়। এ অনেকটা রমণীদেহের লাবণ্যের মত। নারীদেহের লাবণ্য যেমন দেহকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেও দেহকে ছাপিয়ে যায়, তেমনি মহাকবিদের বাণীতেও এমন কিছু থাকে যা কথার অতীত লোকে পাঠককে নিয়ে যায়। পৃথকভাবে প্রতীত এই প্রতীয়মান অর্থটির সন্ধান সহৃদয় পাঠক ছাড়া অন্য কেউ পায় না। এর সঙ্গে কাব্যের ব্যবহৃত শব্দ, গুণ কিংবা অলংকারের কোনো সম্পর্কই নেই। এবারে একটি উদাহরণ দিয়ে ধ্বনির স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

আনন্দবর্ধন একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন :

"ভ্রম ধার্ম্মিক বিশ্রব্ধঃ স শুনকোঽদ্য মারিতস্তেন
গোদাবরীনদীকূললতাগহনবাসিনা দৃপ্ত সিংহেন"

এর বঙ্গানুবাদ করা হয়েছিল

"ভ্রমণ কর গো ধার্মিক তুমি
গোদাবরী তীরে কুঞ্জবনে —
ভয় পেতে সেই কুকুর নিহত
দৃপ্ত সিংহ এসেছে বনে।"

এই উদাহরণে ধ্বনি কোথায় লুকিয়ে আছে সেটি জানার জন্যে ঘটনাটির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কোনো নায়িকার প্রিয়মিলনকুঞ্জে এক তপস্বী এসে সর্বদা পত্রপুষ্প ছিঁড়ে স্থানটির শোভা নষ্ট করত। তপস্বীর আগমন জনিত কারণে মিলনস্থানটির গোপনীয়তাও ব্যাহত হত। নায়িকা সাধুটির এ কাজ পছন্দ না করলেও একদিন তাকে গোদাবরী তীরে কুঞ্জবনে ভ্রমণ করতে বলল এবং তাকে আরও জানালো, যে কুকুরটাকে সে ভয় পেতো সেই কুকরটা নদীতীরে আগত একটি ভয়ঙ্কর সিংহের দ্বারা নিহত হয়েছে। এখানে বুদ্ধিমতী প্রেমিকা ইঙ্গিতধর্মী কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে নিজ কার্য সিদ্ধ করেছে। এখানে বাচ্যবস্তু হল 'ভ্রমণ কর গো'—এই বিধি। কিন্তু ব্যঞ্জনায় যে বস্তুটি পাওয়া যায় তা হল নিষেধ। অর্থাৎ সাধু যে কুকুরটিকে ভয় পেতো সেটি নিহত হয়েছে ঠিকই কিন্তু তার জায়গায়

Scanned with CamScanner

এসে হাজির হয়েছে ভয়ঙ্কর এক সিংহ। সুতরাং সাধুর পক্ষে বনে গমন নিরাপদ হবে না। এই উদাহরণটির বাচ্যার্থ হল যেটা প্রতীয়মানার্থ ঠিক তার বিপরীত। এখানে বিধির মধ্যে দিয়ে নিষেধের ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে এটি একটি শ্রেষ্ঠধ্বনির উদাহরণ।

এ রকম বাচ্যার্থের নিষেধ থেকে ব্যঙ্গ্যার্থে বিধির প্রতীতিও হতে পারে :

"শ্বশ্রূরত্র নিমজ্জিত, অত্রাহং দিবসকং প্রলোকয়।
মা পথিক রাত্র্যন্ধক শয্যায়াং মম নিমঙ্ক্ষ্যসি॥

এর বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে

"ওগো রাত কানা প্রিয়—
যেথা শাশুড়ী ঘুমান বা ঘুমে অচেতন সেই ঠাঁই দেখে নিও।
আমি কোন্‌খানে ঘুমাই ভুলো না—মনে রাখা তব চাই,
রাত্রিতে ভুলে শুয়ো নাকো কভু আমার এ বিছানায়।"

এই শ্লোকের অর্থ হল, কোনো প্রোষিতভর্তৃকা নারীকে দেখে সেখানে আগত এক পথিকের কামোদয় হয়। তখন নারীটি পথিককে জানায় যে তার শাশুড়ী কোন্‌খানে অচেতনভাবে নিদ্রা যায় এবং সেই বা কোন্‌খানে নিদ্রা যায়। রাতকানা পথিক যেন তাদের ঘাড়ে গিয়ে না পড়ে। এখানে বাচ্যার্থে পথিককে নিষেধ করা হলেও ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ত প্রতীয়মান অর্থে নারীটি পথিককে তার শয্যায় আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এখানে বাচ্য অর্থের ঠিক বিপরীত অর্থ প্রতীয়মান অর্থ থেকে লাভ করা যায়। তাই এটিও একটি প্রথম শ্রেণীর ধ্বনির উদাহরণ।

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'যখন বৃষ্টি নামলো' নামে একটি বিখ্যাত কবিতা আছে। এই কবিতার শেষ স্তবকটি নেওয়া যাক্ :

"বৃষ্টি নামলো যখন আমি উঠোন পানে একা
দৌড়ে গিয়ে ভেবেছিলাম তোমার পাবো দেখা
হয়তো মেঘে বৃষ্টিতে বা শিউলি গাছের তলে
আজানুকেশ ভিজিয়ে নিচ্ছো আকাশ ছেঁচা জলে
কিন্তু তুমি নেই বাহিরে—অন্তরে মেঘ করে
ভারি ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরে।"

আপাত সরল এই কবিতটির মধ্যে লুকিয়ে আছে গভীরতর ব্যঞ্জনা। বাচ্যার্থের সিঁড়ি বেয়েই আমাদের পৌঁছাতে হয় সেই ব্যঞ্জনার জগতে। উদ্ধৃত অংশটির প্রথম চার পংক্তিতে যে বাচ্যার্থ আছে তার অর্থ উপলব্ধিতে পাঠকের কষ্ট হয় না। কিন্তু বাধা পেতে হয় শেষের দুই পংক্তিতে এসে। এখানে আর আক্ষরিক অর্থে পংক্তি দুটিকে গ্রহণ করা চলে না। অন্তর, আকাশ নয়, তাই সেখানে মেঘ ঘনিয়ে উঠতে পারে না। আর সেই মেঘ থেকে জলও ঝরে পড়ে না। সুতরাং কবির চিত্রকল্প রচনার উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল তা সহৃদয় পাঠকমাত্রই বুঝতে পারে। সেই প্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় কবিরা

Scanned with CamScanner

বর্ষার সঙ্গে বিরহের সম্পর্ক গেঁথে তুলেছেন। বর্ষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় মিলনের আকাঙ্ক্ষা বাড়ে। আর এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হলেই জাগে বিরহ। বিরহ ও বিচ্ছেদের যন্ত্রনাতেই অন্তরের আকাশে কালোমেঘ ঘনিয়ে আসে, আর সেখান থেকে ঝরে পড়ে ভারি ব্যাপক বৃষ্টি, যা আসলে লবণাক্ত অশ্রু ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই ভাবে মেঘ ও বৃষ্টির সূত্রে ব্যঞ্জনায় পাঠক উপলব্ধি করে 'অবরুদ্ধ আবেগ' ও 'অশ্রু বারিধারা'কে। এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত কবিতাটি বিরহের অতলে পৌঁছে দেয় পাঠককে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের আলোচ্য কবিতাংশটিকে প্রথম শ্রেণীর ধ্বনির উদাহরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, কাব্যাংশটিতে অলংকারের ব্যবহার খুবই কম, তবু এটি সার্থক কাব্যের উদাহরণ হতে পেরেছে ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার গুণে।

ব্যবহারিক জগতের ভাষা বড় বেশি প্রয়োজনের কোঠায় বন্দী। আমরা ভাব-বিনিময়ের জন্যেই কেবল ভাষা ব্যবহার করি—যাকে অন্য অর্থে কমিউনিকেশন বলা যেতে পারে। কাব্যের উদ্দেশ্যও কমিউনিকেশন বা 'সঞ্চার'। তবে প্রয়োজনের কমিউনিকেশন নয়, কাব্যে আমরা আইডিয়ার কমিউনিকেশন চাই। এই আইডিয়া শ্রেষ্ঠ কাব্যে কখনই সরাসরি ব্যক্ত হয় না, তা সংকেতিত বা ব্যঞ্জিত হয়। যেমন ব্যঞ্জিত হয়েছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাতে। কবিতার মধ্যে এই ব্যঞ্জনাটুকু না থাকলে তা যেমন শ্রেষ্ঠ কাব্য হত না, তেমনি ধ্বনিকেও আমরা কাব্যের আত্মা বলতে পারতাম না।

Scanned with CamScanner

কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা

অচিন্ত্য বিশ্বাস

Scanned with CamScanner